কী ছাপব, কেন ছাপব

সীমন্তিনী গুপ্ত

সাংবাদিক

সমুদ্রের ধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একরত্তি দেহটা। নীল রঙা হাফপ্যান্ট, লাল টি-শার্ট। ডান হাতটা মুঠো-করা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। গালটা ভেজা বালির উপরে পড়ে, হাল্কা বাদামি চুল ভিজে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ে।

এই ছবিই মাসদু'য়েক আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্বাস্তু নীতিকে বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধ-ধ্বস্ত সিরিয়া থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়েছিলেন আবদুল্লা কুর্দি। তুরস্কের বদরাম হয়ে গ্রিসের কোস দ্বীপের উদ্দেশে সপরিবার পাড়ি জমিয়েছিলেন। আশা ছিল, পশ্চিমি নিরাপত্তায় স্ত্রী রেহান এবং দুই ছেলে গালিপ ও আয়লানকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবেন। কয়েক মাস ধরেই তুরস্ক থেকে সমুদ্রপথে গ্রিস হয়ে ইউরোপে ঢুকছেন হাজার হাজার শরণার্থী। তাঁদের অনেকের মতো একটা ১৫ ফুটের ডিঙিতে করে জনা কুড়ি শরণার্থীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন আবদুল্লা। কিন্তু মাঝসমুদ্রে উল্টে যায় তাঁদের ডিঙি। নিজে বেঁচে গেলেও রেহান ও দুই ছেলেকে বাঁচাতে পারেননি তিনি। তুরস্কেরই সমুদ্রসৈকতে ভেসে ওঠে আয়লান, গালিপ ও রেহানের দেহ।

সমুদ্রতীরে তিন বছরের সেই আয়লান কুর্দির ছবি ৩ সেপ্টেম্বর ইউরোপের প্রায় সব কাগজের প্রথম পাতায় বড় করে ছাপা হয়েছিল। শিরোনামে জরুরি প্রশ্ন, 'ইউরোপ, এর পরেও কি তোমরা উদ্বাস্তুদের হাহাকার শুনতে পাবে না?' সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি হুহু করে ছড়ানোর পরে সাড়া পড়ে গিয়েছিল সারা পৃথিবীতে। সকলের মুখে একটাই কথা— আইএস-তাণ্ডবে পশ্চিম এশিয়ায় তৈরি এই ভয়াবহ উদ্বাস্তু সমস্যার শেষ কোথায়? নিরীহ শিশুর অপমৃত্যুর এই ভয়াবহ ছবি দেখার পরেও কি শরণার্থীদের প্রতি ইউরোপের মনোভাব বদলাবে না? প্রবল চাপের মুখে পড়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দেড় লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে তারা। গত মাসে প্যারিসে জঙ্গি হামলার পরে অবশ্য আবার সেই শরণার্থী নীতিও প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি। কারণ, প্যারিস হামলার মূল জঙ্গি সালাহ আবেদসলাম শরণার্থী সেজেই ইউরোপে ঢুকেছিল। প্রশ্ন ওঠে, তা হলে কি শরণার্থীদের ছাড়পত্র দিয়ে নিজেদেরই বিপদ ডেকে এনেছে ইউরোপ।

কূটনীতির চুলচেরা প্যাঁচ-প্রশ্ন আপাতত থাক। আমরা আর এক বার ফিরে যাই ছোট্ট আয়লানের সেই ছবিতে।

সাংবাদিকতায় ‘ডিসেন্সি অ্যান্ড ডিস্ক্রিশন’ বলে একটা কথা চালু আছে। কী ছাপব, কেন ছাপব, সেই বিষয়ে একটা সচেতনতা, একটা মূল্যবোধ সব সময়ে থাকা উচিত। খবরের খোঁজে যেন আমরা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে না-যাই। সেই সচেতনতা থেকেই কোনও দুর্ঘটনার পরে মৃতদেহের ছবি কাগজে ছাপা বা টিভিতে দেখানো হয় না। বা ছাপা হলেও থ্যাঁতলানো মুখ বা বেরিয়ে আসা ঘিলুর জায়গাটা ঝাপসা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ফুটফুটে আয়লানের মৃতদেহের ছবি ‘সংবাদমাধ্যমে শালীনতার মাত্রা ঠিক কী’, সেই বিতর্কটা ফের উস্কে দিল।

এই ‘ডিস্ক্রিশন’ অবশ্য আমরা, সংবাদমাধ্যমের জগতে অনেক সময়েই খুব সচেতনভাবে বজায় রাখার চেষ্টা করি। যেমন করা হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধী নিহত হওযার পরে। আত্মঘাতী জঙ্গির বিস্ফোরণে রাজীবের শরীর এমন ভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, লোকসমক্ষে সেই দেহ আর বার করা করা হয়নি। ছবি তোলার তো প্রশ্নই ওঠে না! তিন মূর্তি ভবনে শায়িত ছিল তাঁর কফিন-বন্দি দেহ, তেরঙ্গায় মোড়া। তামিলনাড়ুর শ্রীপেরমপুদুরে সেই বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন যাঁরা, তাঁদের কাছ থেকে জানা যায়, শরীরে বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ উড়ে গিয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর, বাঁ হাঁটুর নীচে আর কিছুই ছিল না, বাঁ হাত, কাঁধ ও পাঁজরের জায়গায় তৈরি হয়েছিল বিশাল গহ্বর। থেঁতলে গিয়েছিল মাথার পিছনের দিকটা, বেরিয়ে এসেছিল ঘিলু। ছ’ফুট দেহটা এতটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, সেলাই করে জোড়া-তাড়া দেওয়ার পরেও সেটা অনেক ছোট হয়ে গিয়েছিল, আর সহজেই ঢোকানো গিয়েছিল সাড়ে পাঁচ ফুটের কফিনে!

তখনকার সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ, সেই ছবি তাঁরা আমাদের কাছে পৌঁছে দেননি। রাজীবের মৃত্যুর পরের দিন তাঁর সৌম্যকান্তি হাসিই জুড়ে ছিল কাগজের প্রথম পাতা। তবে কিছু দিন পরে একটি পত্রিকায় রাজীবের ক্ষতবিক্ষত মাথার ছবি বেরিয়েছিল এবং শীতের সকালে গরম কচুরির মতো মুহূর্তে বিক্রি হয়ে যায় সেই সংখ্যার প্রত্যেকটি কপি। তা ছাড়া, অন্য কয়েকটি পত্রিকায় একটা রক্তমাখা সাদা জুতোর ছবি বেরিয়েছিল বটে, বোমায় উড়ে রাজীবের দেহ থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছিল সেটি। ব্যস, ওইটুকুই।

ব্যতিক্রম কি নেই? নেই কি সংবাদমাধ্যমে শালীনতা লঙ্ঘনের উদাহরণ? প্রচুর আছে। যেমন, যে এলটিটিই-র বোমায় নিহত হয়েছিলেন রাজীব, সেই এলটিটিই প্রধান প্রভাকরন এবং তাঁর ছেলে বালচন্দ্রনের মৃতদেহের ছবি। গুলিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাওয়া ১২ বছরের বালচন্দ্রনের ছবি আমরা দেখেছি। দেখেছি, গুলিতে খুলির ডান দিকটা প্রায় উড়ে যাওয়া তার বাবার ছবিও। তার কয়েক বছর আগে চন্দন-দস্যু বীরাপ্পনের মৃতদেহের ছবিও বেরিয়েছিল কাগজে কাগজে। তারও কপালের ডান দিকে একটা বড় গর্ত— বুলেটের। রক্তমাখা, ক্ষতবিক্ষত কিষেণজির মৃতদেহের ছবি এখনও হয়তো অনেকের মনে আছে। রাজীবের স্মিত হাসির পাশে প্রভাকরণের উড়ে যাওয়া খুলির ছবি বসিয়ে কি কোনও সমীকরণ বানানোর চেষ্টা করছেন? ভাবছেন, রাষ্ট্রনেতার মর্মান্তিক ছবি ছাপার সময়ে ‘ডিস্ক্রিশন’ প্রয়োগ করা হলেও ‘দুষ্টু লোকদের’ ক্ষেত্রে সেই ‘শালীনতা’ ও ঔচিত্যবোধ যেন কোন ম্যাজিকে উধাও হয়ে যায়?

হয়তো খুব ভুল ভাবছেন না। এই সমীকরণের নানা স্তর, নানা দিক। যেমন পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে অনেক দিনের অভিযোগ, তারা সাদা মৃতদেহকে যতটা 'মর্যাদা' দেয়, তার কানাকড়িও দেয় না কালো, বাদামি বা হলুদ দেহগুলোকে। তাই আইএস জঙ্গিদের হামলায় নিহত সিরীয় শিশুর মুখের 'ক্লোজ আপ' নিতে হামলে পড়েন মার্কিন চিত্রসাংবাদিকেরা, কিন্তু খামখেয়ালি বন্দুকবাজের গুলিতে যখন আমেরিকার কোনও কলেজ-পড়ুয়া মারা যান, তখন তাঁর দিকে ক্যামেরার লেন্স ফেরানোর আগে সাত-পাঁচ ভাবেন ফোটোগ্রাফার।

এই 'সংযমের' অন্যতম উদাহরণ ৯/১১। মার্কিন অর্থনীতির জোড়া গম্বুজ জ্বলছে, তার পর ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে, এই ছবি আমাদের সকলেরই খুব পরিচিত। কিন্তু যে ২৯৭৫ জন সেই হামলায় মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের কারও থেঁতলানো, ঝলসানো মুখ তো তাড়া করে বেড়ায় না আমাদের, যে-ভাবে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ছোট্ট আয়লানের ছবি।

এত সব বিতর্কে অবশ্য একটা জরুরি কথা আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। তা হল, আয়লানের মৃত্যুর মতো 'নাটকীয়' ছবি ছাপার প্রয়োজনও রয়েছে। একটু পুরনো একটা ছবিতে ফিরে যাই। ২০০৯ সালের ২০ জুন তেহরানের রাস্তায় পুলিশের গুলিতে মারা যান নেডা। ইরানি তরুণী নেডা আগা সোলতান। সেখানে তখন নির্বাচন-পরবর্তী বিক্ষোভ চলছিল। গানের ক্লাসে যাওয়ার পথে বিক্ষোভকারীদের ভিড়ে ঢুকে পড়েছিলেন নেডা, পুলিশের গুলি তাঁর বুক ফুঁড়ে দেয়। মৃত্যুর আগের কয়েকটা মুহূর্তের ভিডিও তুলে রেখেছিলেন কেউ। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছিল, চোখের কোনা দিয়ে, নাক দিয়ে, ঠোঁটের কষ দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। তার পর ক্যামেরা ঘুরে যায় বুকের দিকে। হ্যাঁ, ওখানেই তো লেগেছিল গুলিটা। সেই ফুটো দিয়েও বেরিয়ে আসছে রক্ত, পিচকিরির মতো এসে পড়ছে ফুটপাথে।

নেডার মৃত্যুর সেই ভয়াবহ ছবিই বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। তেহরান থেকে নিউ ইয়র্ক, সর্বত্র বিক্ষোভকারীদের হাতে নেডার রক্তস্নাত মুখের পোস্টার। তাতে লেখা, 'নেডা, তোমাকে ভুলব না। তুমি বেঁচে থাকবে আমাদের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে'। মুহূর্তে নেডার স্মরণে তৈরি হয়ে যায় একাধিক ফেসবুক পেজ, তৈরি হয় বেশ কয়েকটি কমিউনিটি, যাদের সদস্য-সংখ্যা কয়েক হাজার। বিক্ষোভকারীদের থামাতে তখন ফেসবুক-সহ বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং সাইটের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদ। নেডার মৃত্যুকে তখন বলা হয়েছিল— পৃথিবীর সব থেকে 'দেখা' মৃত্যু, the most widely witnessed death in human history!

দর্শক টানার মর্মান্তিক খেলায় ইরানের নেডাকে আপাতত পেছনে ফেলে দিয়েছে সিরিয়ার আয়লান। আর 'কী ছবি ছাপব, কতটুকু দেখাব' এই প্রশ্নের চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়ার আগে হঠাৎ দেখলাম পার্ক স্ট্রিটের গণধর্ষিতা সুজেট জর্ডনের বাবা টিভির পর্দায়। মেয়েকে যারা নির্যাতন করেছিল, তাদের কয়েক জন দোষী প্রমাণিত হওয়ায় পিটার জর্ডনের চোখে অঝোর জল।

ক্যামেরার শক্তিশালী লেন্স একটা ফোঁটাকেও পালাতে দিচ্ছে না।